দ্বিতীয় প্রবাস - ৬

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

মৃত্যুশোক নিশ্চয়ই শোকার্তের মুখচ্ছবি এমন বিষম ভাবে বদলে দেয় যা মাসুম বাচ্চাদের চোখও এড়িয়ে যেতে পারে না। তা না হলে আমার ছোট্ট দুই নাতি-নাতনি কি করে বুঝলো যে আমি খুব 'স্যাড' ? তারা দুজনেই আমার কাছে এসে ঘুর ঘুর করে, হাতের আংগুল নিয়ে খেলা করে কিন্তু তাদের সাথে খেলা করা কিংবা তাদেরকে নিয়ে বাইরে যাবার বায়না ধরে না। চোখ মুদলেই স্মৃতির এলবামের পাতাগুলো খুলে যায় আর সদ্য ছবি হয়ে যাওয়া আমার মা মুর্তিমতি হয়ে কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে শুধান 'ভাল আছিসতো বাবা?' বার্চ, ওক আর ম্যাপল গাছে অনুরণিত সে কুশল প্রশ্ন শুনে নিজের অজান্তেই যখন দু'চোখ গড়িয়ে জল নামে তখনই আমার নাতনি মিঢ়েয়া তার ছোট হাতে টিসু পেপার নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে 'প্লিজ ডোন্ট ক্রাই নানা ভাই'। আমি নিজেও কি কাঁদতে চাই? কিন্তু আমার অন্তর্লীন অতীন্দ্রিয় সত্তাতো আমার চাওয়া না চাওয়ার ধার ধারে না; সে তো সুনীল মহাকাশে, দিগন্তের নিপাট খোলা জানালায় আমার মা নামের সেই জ্যোতির্ময়ী মহিলার সাথে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন - আমার সারা জীবনের হাসি-কান্না আর আনন্দ-বেদনার ছবি খুঁজে বেড়ায়। আল্লাহকে ডাকি, কাতর কণ্ঠে বলি 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুনা ধারায় এসো'; আমাকে ধৈর্য দাও, এই দুঃখ সইবার শক্তি দাও।

আমি নিশ্চয়ই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত - সম্ভবতঃ এই ভাবনা থেকে ছয়ই আগষ্ট সকালে টরন্টো থেকে আমার বড় শ্যালিকা নুরুন নাহার (রাকিম) আর তার স্বামী উইং কমান্ডার (অবঃ) সাইদুর রহমান এসে হাজির। বছরখানেক আগে সাইদ ও তার মাকে হারিয়েছে। সেও আমারই মতো তার মায়ের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেই ঢাকা গিয়ে মাকে দেখে এসেছিল। আর সে কারণেই তার ধারণা হয়েছে আমার মানসিক সাপোর্ট দরকার। আশীর শতকের প্রথমার্ধে, নির্ধারিত সময়ের বহুদিন আগেই সাইদ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে কানাডার অটোয়ায় অভিবাসী হয়। ১৯৭৩ সনে পাকিস্তানের বন্দীশিবির থেকে ছাড়া পেয়ে সদ্য বাংলাদেশে ফিরে আসা সাইদ-রাকিম নিজেদের আলাদা বাসা নেবার আগে বেশ কিছুদিন আমাদের সাথেই ছিল। স্বাধীনতা উত্তর বাকশালী দুঃশাসনের সেই কঠিন সময়গুলোতে আমাদের ৩০৭ নম্বর ইলেফেন্ট রোডের বাসায় আমাদের দু পরিবার নিজেদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা ভাগ করে বেঁচে থাকার প্রয়াস পেয়েছি। সুকণ্ঠী এবং সদা সুহাসিনী রাকিম - আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং আদরের 'ছোট গিন্নী' - কি আশ্চর্য যাদুবলে যেন সব প্রতিকুল এবং শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতিকেই অনুকুল এবং সুসহ করে নিতে পারতো। সাইদ-রাকিম যুগলের সঙ্গ আমার জন্য সব সময়ই আনন্দের; আমার জীবনের এই চরম দুঃখের

প্রহরে তাদের দুজনকে কাছে পেয়ে মনে হোল আমার শুষ্ক, রিক্ত বুকে যেন হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

সাইদ-রাকিম মিডল্যান্ডে তিন দিন ছিল। আশ্চর্য চাতুর্যে ওরা সারাক্ষন আমাকে ব্যস্ত রাখলো। গতানুগতিক সান্ত্বনা বানী কিংবা হা- হুতাশের মাধ্যমে নয়, ওরা সম্পূর্ণ অন্যভাবে আমার দুঃখ ভোলানোর প্রয়াস পেল। অক্টোবরের শেষ উইক-এন্ডে কানেকটিকাটে আমাদের ছেলে শেরিফের বিয়ে হবে। তার প্রস্তুতি নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো আর সে ব্যস্ততায় আমাকেও কেমন করে জড়িয়ে নিল। জীবনের মহাকাব্য এখন আমাদের জীবনের নুতন অধ্যায় - আমাদের একমাত্র পুত্র শেরিফের সংসারজীবনে প্রবেশ - লিখার আয়োজন করছে। সেই অনাগত ভবিষ্যতকে ঘিরে আমাদের পরিবারে যে নুতন প্রভাতের স্বপ্ন রচনা চলছে, সে স্বপ্ন বিলম্বিত লয়ে হলেও মায়ের মৃত্যুশোককে আস্তে আস্তে প্রশমিত করছে।

সাইদ রাকিম চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে আমি আবার নিজের রুটিন জীবনে ফিরে আসার চেষ্টায় লেগে গেলাম। সকালে ইন্টারনেটে বিশ্বসংবাদ পড়ি। এরপর নাতি-নাতনীকে নিয়ে এক-আধটু খেলা বা গাল গল্প করার কাজে লেগে যাই। দুপুরে গোসল করে খাওয়া দাওয়া সেরে আমার গবেষণার কাজ নিয়ে বসি। বিকেল পাঁচটার দিকে ঘন্টাখানেকের জন্য ইন্টারনেটে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা দেখে হাটতে বের হই। কোন কোন সন্ধ্যে বেলা এর ওর বাসায় নিমন্ত্রন রক্ষা করতে হয়। মিডল্যান্ডে বাংলাদেশের বাংগালী খুব বেশী নেই, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বেশ কয়েকটি পরিবার আছে। এই সব পরিবারেই সোনিয়ার খুব আদর। মাসী, পিসী, দাদা, দিদি সম্পর্ক পাতিয়ে সোনিয়া এদেরকে অত্যন্ত আপন করে নিয়েছে। সেন্ট্রাল মিশিগান বিশবিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তী আর তার স্ত্রী মুনমুন , ডাউ কর্নিয়ের কিশলয় আর তার স্ত্রী মাম্পা ভট্টাচার্য, সুজিত সাহা আর তার স্ত্রী কৃষ্ণা সোনিয়া-নোমানকে নিজেদের পরিবারেরই একজন বলে মনে করে। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর এদের প্রায় সকলেই সহমর্মিতা জানিয়েছেন। এ ছাড়া মিডল্যান্ডে কিছু ভারতীয় মুসলিম, পাকিস্তানী এবং আরবী ভাষাভাষী মুসলিম পরিবারের সাথেও সোনিয়া-নোমানদের বেশ ভাব রয়েছে। মাঝে সাঝে এদের ওখানেও যাই। এসবের মাঝে ব্যস্ত থেকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা চালাই।

ভাগ্যবতি এক রাষ্ট্রপ্রধান ও দুর্ভাগা এক মহান কবি

এক মৃত্যুশোক মনে হয় আরেক মৃত্যুশোককে ক্ষণিকের তরে হলেও ভুলিয়ে দিতে পারে। সতেরোই আগষ্ট বাংলাদেশের সব পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের প্রধানতম কবি শামসুর রাহমানের মহাপ্রয়ানের সংবাদ পেয়ে আমি তাৎক্ষনিক ভাবে আমার মায়ের শোক ভুলে গেলাম। যে কবি আজীবন সত্য, ন্যায় ও

সুন্দরের জন্য সংগ্রাম করেছেন; যিনি 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', কিংবা 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' এর মতন অমর কালজয়ী কবিতা লিখে মুক্তিযুদ্ধে এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সেই কবিকে রাষ্ট্রীয় সন্মানে সমাহিত করা হলোনা এ দুঃখ রাখার জায়গা কোথায়। অথচ এর মাত্র চারদিন পর, ২১শে আগষ্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম সানাই শিল্পী ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান পরলোক গমন করলেন । তার বিদেহী আত্মার সন্মানে সেদিনটিতে ভারতবর্ষে সরকারী ছুটি ঘোষনা করা হয়, রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালন করা হয় এবং তাকে রাষ্ট্রীয় সন্মানের সাথে সমাহিত করা হয়। মৌলবাদী জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার দলীয় সন্ত্রাসী সগিরের লাশকে ফুলের মালা দিয়ে সন্মান জানাতে ভোলেন নাই; কিন্তু দেশের প্রধানতম কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি যেতে পারেন নি।

মহান এক রাষ্ট্রপ্রধান ও ভাগ্যবান এক শিল্পী

অবশ্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জন্য এই আচরনটাই কি স্বাভাবিক নয়? যার কল্যাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী, খুনী, আলবদররা দেশের মন্ত্রী হয় তিনি কি করে স্বাধীনতার মশালবাহী, শান্তির দূত কবি শামসুর রাহমানকে শ্রদ্ধা জানাবেন। আসলে আমারই হয়েছে ভীমরতি, আমি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র ডিফিল, বিশ্ববরেণ্য ডঃ মনমোহন সিং এর সাথে এ কার তুলনা করছি?

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)